আমাদের সময়

তারিখ 11 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার জরুরি

ম. ইনামুল হক

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হবে প্রাক উচ্চতর শিক্ষা। এই স্তরে বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা এবং পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। এরপর শিক্ষার্থী ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, অর্থনীতি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি যে কোনো তিনটি বিষয় এবং কারিগরি একটি বিষয় পড়তে পারবে

গত ২৩ নভেম্বর ২০১৫ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপক্ষের এক আপিল খারিজ করে বলেছেন, হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী চাইলে শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরপত্র (মার্কশিট) দিতে হবে। এ বিষয়ে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন নাফিস সালমান খান এবং তার পক্ষে আদালতে উপস্থিত থেকেছেন অ্যাডভোকেট এ কে এম সালাউদ্দিন খান (দৈনিক আমাদের সময় ২৪ নভেম্বর ২০১৫)। আপিল বিভাগের রায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১২ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে বলে, সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে অনুষ্ঠেয় মাধ্যমিক পরীক্ষা ও ২০০৩ সালে অনুষ্ঠেয় উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা থেকে ফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক. পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কোনো বিভাগ থাকবে না। খ. শুধু প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড ও সব বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের (জিপি) ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ (জিপিএ) উল্লিখিত থাকবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক এবং মেধা তালিকা প্রণয়ন বা প্রকাশের প্রচলিত প্রথা থাকবে না।

গত ৯ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশের একটি টেকনিক্যাল বোর্ড ও একটি মাদ্রাসা বোর্ডসহ ১০টি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার গত বছরের চেয়ে পাসের হার এবং জিপিএ ৫ পাওয়ার হার কম হওয়ায় নানা তরফ থেকে প্রশ্ন উঠছে, হলোটা কী? ১০ আগস্ট ২০১৫ একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইংরেজিতে ১৯% পরীক্ষার্থী ফেল করা, প্রথম চালু হওয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ১৩% ফেল করা, সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে জটিলতা, মাতৃভাষা বাংলায়ও ফল খারাপ করা এবং যশোর বোর্ডের ফল বিপর্যয় মোট ফলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এবার রাজশাহী বোর্ডে ৭৭.৫৪%, সিলেট ৭৪.৫৭%, দিনাজপুর ৭০.৪৩%, বরিশাল ৭০.০৬%, ঢাকা ৬৮.১৬%, চট্টগ্রাম ৬৩.৪৯%, কুমিল্লা ৫৯.৮০% ও যশোর বোর্ডে ৪৬.৪০% প্রার্থী পাস করেছে, যা গড়ে ৬৫.৮৪%। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৭৫.৭৪%। এবার জিপিএ ৫ পাওয়ার সংখ্যা কমে হয়েছে ৩৪ হাজার ৭২১ যা গত বছর ছিল ৫৭ হাজার ৭৮৯। যশোর বোর্ডের ফল বিপর্যয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে বড় ধরনের ত্রুটি আছে যা এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে। জানা গেছে, অনেক শিক্ষার্থী যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছিল তারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করেছে। আগের বছরগুলোতে যারা উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছিল তাদের অনেকের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষদের অভিযোগ রয়েছে, তারা এক লাইন সঠিক ইংরেজি লিখতে পারে না। এবার ইংরেজি পরীক্ষায় ফেল করার সংখ্যা বৃদ্ধিতে অনেকে মনে করতে পারেন কড়াকড়ি হয়েছে। না, কয়েক বছর যাবৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষকদের বেশি নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এবারও দেওয়া হয়েছে। তবে যশোর বোর্ডের ইংরেজি প্রশ্ন নাকি কঠিন ছিল। নোটবই বা গাইড বই অনুসরন না করে প্রশ্ন করার ব্যাপারে সরকারি আদেশকে তারা পালন করেছিলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়টি নতুন হওয়ায় এর একটা ধাক্কা আছে। সৃজনশীল প্রশ্ন করার ব্যাপারে জটিলতা থাকলে তাও সবাইকে ধাক্কা দিয়েছে। তবে মাতৃভাষা বাংলায় ফল খারাপ করার ব্যাপারে কী বলা যায়? আমাদের ছেলেমেয়েরা কি ক্রমেই তাদের ভাষাকেও অবজ্ঞা করতে চলেছে?

মাধ্যমিক কী উচ্চমাধ্যমিক, ফলাফল যাই হোক, চলতি শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরীক্ষকদের বেশি নম্বর দেওয়ার নির্দেশের লক্ষ্য অবশ্যই অনেক বেশি করে পাস দেখানো এবং অনেক বেশি শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের জিপিএ ৫ পাওয়ার সুখ দেওয়া। শিক্ষা ও জীবনের পরবর্তী ধাপগুলোতে জিপিএ ৫ পাওয়াদের ভিড়ে প্রকৃত মেধাবীরা তদবির ও দুর্নীতির পথ দখলকারীদের ধাক্কায় কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ছে। শিক্ষাজীবনে রাজনীতির প্রভাব বিশেষ করে সরকারি দলের রাজনীতির সঙ্গে লিপ্ত হয়ে অর্থবিত্ত ও অবস্থানে আকাশচুম্বী সাফল্যের হাতছানি অমেধাবী কিন্তু দুষ্ট ছাত্রদের আগ্রহী এবং মেধাবী ছাত্রদের হতোদ্যম করে মানসিক রোগীতে পরিণত করছে। এই ধরনের অগ্রযাত্রা বাংলাদেশের সমাজে কী হতে পারে– এমন প্রশ্ন আসা অস্বাভাবিক নয়।

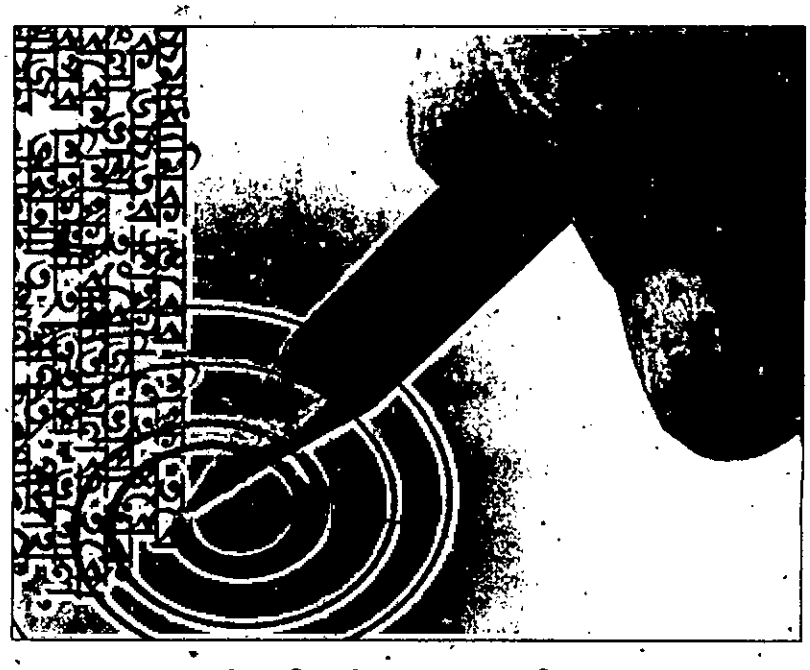

মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের বেশি করে পাস করানো এবং গ্রেড পদ্ধতির প্রবর্তন বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য কেবল বাংলাদেশকেই এই পরামর্শ দিয়েছে তা হতে পারে না। আমাদের পাশে ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও গ্রেড পদ্ধতি চালু আছে এবং তা বিশ্বব্যাংকের পরামর্শেই হয়েছে ধারণা করা যায়। তবে তারা ফলাফলে গ্রেডের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর পাওয়া নম্বরও জানিয়ে দেয়। সেটাই সঠিক বলা যায়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, প্রাপ্ত নম্বর দেখে মেধাতালিকা প্রস্তুত করা যায়। বাংলাদেশে উচ্চমাধ্যমিকে প্রতি বছর অর্ধলক্ষ জিপিএ ৫ পাওয়ার মধ্যে প্রকৃত মেধাবী খুঁজে পাওয়া একবারেই অসম্ভব। আমি অবিলম্বে শিক্ষানীতির পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গের মতো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত গ্রেডের সঙ্গে প্রাপ্ত নম্বরও জানিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি চালু করতে বলছি। গত ২৩ নভেম্বর ২০১৫ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেওয়া রায় এই ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি একই ধরনের শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেলা শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে বলছি। বোর্ড পর্যায়ে নিম্নমাধ্যমিক পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। আমি বরং কারিগরি, মাদ্রাসা ও সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলামে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত একটি কারিগরি বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানোর পক্ষপাতী। এর ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস হলে আমাদের যুবশক্তি দক্ষ জনবলও হয়ে উঠবে। এভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, প্রাক উচ্চতর শিক্ষা এবং উচ্চতর শিক্ষা নামের চারটি স্তর করার পরামর্শ দিচ্ছি। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয় সরকারি অথবা বেসরকারি হবে। সব কোচিং সেন্টারকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হবে, ফলে তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ছাত্র পাঠাতে পারবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের দুই জায়গায় ভর্তি হওয়া বা অতিরিক্ত পড়ার বা বাবা-মায়ের অতিরিক্ত ব্যয় বহনের চাপ থাকবে না।

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারি করা হবে এবং সেগুলোতে এতিমখানা রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে। সরকারি এবং বেসরকারি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রাথমিক স্তরে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম থাকবে এবং একই সিলেবাসে পড়ানো হবে। প্রাথমিক স্তরে প্রত্যেক শিশু চার বছর বয়স হলে শিশু শ্রেণিতে নিজ মাতৃভাষায় অক্ষরজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান অর্জন করবে। প্রথম শ্রেণিতে নিজ মাতৃভাষা বা বাংলা ভাষায় শব্দ ও বাক্য গঠন এবং প্রাথমিক গণিত শিক্ষা, দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অতিরিক্ত বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষা এবং মাতৃভাষায় পরিবেশ শিক্ষা, তৃতীয় শ্রেণি থেকে বাংলা ভাষায় ইতিহাস শিক্ষা, চতুর্থ শ্রেণি থেকে বাংলা ভাষায় ভূগোল শিক্ষা এবং পঞ্চম শ্রেণি থেকে বাংলা ভাষায় দেশের নানা জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। নিম্নমাধ্যমিক থেকে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা অথবা ইংরেজি হবে। মাদ্রাসায় আরবি ভাষা অতিরিক্ত শেখানো হবে। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান ও বইপত্র প্রদান করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা পৃথক নিয়মে চলবে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষাই হবে প্রধান। এই স্তরের শিক্ষায় বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোল একত্রে, বিজ্ঞান ও পরিবেশ একত্রে, সমাজ ও সংস্কৃতি একত্রে, গণিত, কৃষি বাধ্যতামূলক হবে। বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যম, স্কুল, মাদ্রাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে নিজ মাতৃভাষা বা নিজ ধর্মসংক্রান্ত একটি ভাষা শিখতে পারবে। এছাড়া শিক্ষার্থীকে ঘর ব্যবস্থাপনা, বাগান ব্যবস্থাপনা, শস্য ব্যবস্থাপনা, ইলেক্ট্রনিক্স, কার্পেন্টারি, ড্রাইভিং, ওয়েল্ডিং, প্লামবিং, পেইন্টিং ইত্যাদির একটি শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষাই হবে প্রধান। এই স্তরের শিক্ষায় বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, গণিত, কৃষি, পরিবেশ বাধ্যতামূলক হবে। শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে নিজ মাতৃভাষা বা নিজ ধর্মসংক্রান্ত একটি ভাষা শিখতে পারবে। এছাড়া শিক্ষার্থীকে ঘর ব্যবস্থাপনা, বাগান ব্যবস্থাপনা, শস্য ব্যবস্থাপনা, ইলেক্ট্রনিক্স, কার্পেন্টারী, ড্রাইভিং, ওয়েল্ডিং, প্লামবিং, পেইন্টিং ইত্যাদির একটি শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হবে। এই স্তর শেষে ইংরেজি 'ও' লেভেলের সমান হিসেবে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হবে প্রাক উচ্চতর শিক্ষা। এই স্তরে বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা এবং পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। এরপর শিক্ষার্থী ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, অর্থনীতি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি যে কোনো তিনটি বিষয় এবং কারিগরি একটি বিষয় পড়তে পারবে। প্রাক উচ্চতর এবং উচ্চতর শিক্ষার লক্ষ্য হবে দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা, যারা দেশের প্রশাসন, উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্যসেবা, পরিবেশ রক্ষা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ইত্যাদির বিষয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট দূর করার জন্য সেমিস্টার প্রথা চালু করা হবে। সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিমুক্ত করা হবে। শিক্ষালয়গুলো দেশের অন্যান্য গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

লেখক : প্রকৌশলী
minamul@gmail.com